বাংলাদেশ
জার্নাল
অব
পলিটিক্যাল
ইকোনমি

© ২০২১ বাংলাদেশ জার্নাল অব পলিটিক্যাল ইকোনমি
খণ্ড ১, সংখ্যা ১, ডিসেম্বর ২০২১, পৃষ্ঠা, ১৯১-২০২
বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
(আইএসএসএন ২২২৭-৩১৮২)

চট্টগ্রামের ব্যাংকিং এবং কতিপয় বিশেষ ঝুঁকি

এস এম আবু জাকের*

মূল শব্দ *অপ্রাতিষ্ঠানিক ব্যাংকিং, বাণিজ্যিক ব্যাংক, মহাজনী সুদ, টু-টু প্রথা, আর্থিক ঝুঁকি, ডিও ইস্যু, চট্টগ্রামের ভৌগোলিক অবস্থান*

ভূমিকা

একটি দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বিশ্লেষণ করতে গেলে ব্যাংকিং বিষয়টা সামনে চলে আসে। কারণ, অর্থনৈতিক উন্নতি ব্যাংকিং ব্যবসার প্রসারের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বিশ্বের ব্যাংকিংয়ের ইতিহাস যেমন অপ্রাতিষ্ঠানিক ব্যাংকিং দিয়ে শুরু, তেমনি বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রবেশদ্বার চট্টগ্রামও এ ধারার ব্যতিক্রম নয়।

আজকের ব্যাংক ব্যবসার উৎপত্তি খুঁজতে হলে যেতে হবে খৃষ্টপূর্ব ২০০০ অব্দে। তখন ব্যাবিলনবাসীরা উপাসনালয়ের আস্থাভাজন ও বিশ্বস্ত পুরোহিতের কাছে তাদের আমানত গচ্ছিত রাখত। সে সময় পুরোহিতগণ উপাসনালয়েই আমানত সংরক্ষণ করত ও সমাজে যাদের প্রয়োজন তাদেরই ঋণ প্রদান করত। ব্যাংকের মৌলিক কাজ দুটির শুরু এভাবেই। কিন্তু অধর্ম ও নীতিহীনতার কারণে পুরোহিতগণ জনসাধারণের আস্থা হারান।

পরবর্তী পর্যায়ে রোমে ব্যক্তিগত উদ্যোগে ব্যাংক-এর উৎপত্তি ও প্রসার ঘটে। এটা ছিল খৃষ্টপূর্ব ১০০০ অব্দের ঘটনা। ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত এসব ব্যাংক আমানত গ্রহণ করত, চেক ও ড্রাফট মারফত আমানত পরিশোধ করত ও ব্যবসায়ীদেরকে ঋণ দান করত। তবে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ব্যাংক যাত্রা শুরু করে ১৪০২ সালে ব্যাংক অব বার্সেলোনা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। এটাই পৃথিবীর প্রথম আধুনিকতম ব্যাংক। এই উপমহাদেশে প্রথম সুসংগঠিত ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় ১৭০০ সালে যার নাম ছিল হিন্দুস্তান ব্যাংক, স্থাপিত হয় কোলকাতায়।

* ইভিপি ও আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, এক্সিম ব্যাংক, চট্টগ্রাম; ফোন: ০১৭১৩-১০২০১২ ই-মেইল: smabuzaker@gmail.com

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি চট্টগ্রাম আঞ্চলিক সেমিনার ও চট্টগ্রাম চ্যাপ্টারের ৪র্থ দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন ২০১৯ আঞ্চলিক সেমিনারে পঠিত, ২ মার্চ ২০১৯।

আমাদের এই অঞ্চলে ১৮৪৬ সালে প্রথম বাণিজ্যিক ব্যাংক স্থাপিত হয়। স্থানীয় জমিদার, উকিল, ব্যবসায়ী, ব্রিটিশ কর্মকর্তা ও ইউরোপীয় নীল চাষি প্রভৃতি শ্রেণির লোকের উদ্যোগে একটি অংশীদারী কোম্পানি হিসেবে 'ঢাকা ব্যাংক' প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮০৯ সালে কোলকাতায় প্রতিষ্ঠিত 'ব্যাংক অব বেঙ্গল' এঅঞ্চলে শাখা না খুলে 'ঢাকা ব্যাংকের' সুনাম ও ভালো ব্যবসা বিবেচনায় এনে ঢাকা ব্যাংককে ক্রয় করে নেয় এবং এটাকে নিজেদের একটি শাখায় রূপান্তর করে। ব্যাংক অব বেঙ্গল পরবর্তী সময়ে এ অঞ্চলে বিভিন্ন স্থানে শাখা খোলে। এর দ্বিতীয় শাখা খোলা হয় ১৯০৬ সালে চট্টগ্রামে।

১৮৬২ সালের পরবর্তী সময়ে স্থানীয়ভাবে বহু ব্যাংক স্থাপিত হয়। অবশ্য তখন এর অনেকগুলোকে ব্যাংক না বলে লোন অফিস বলা হতো। তবে এদের কার্যাবলী ছিল ব্যাংকের মতো। চট্টগ্রামে প্রতিষ্ঠিত সে ধরনের ব্যাংকের মধ্যে ছিল ১৯১০ সালে প্রতিষ্ঠিত মহালক্ষ্মী ব্যাংক।

১৯৪৬ সালে এ দেশে মোট ব্যাংকের সংখ্যা ছিল ২২টি। এ ২২টির মধ্যে তফসিলভুক্ত ব্যাংক ছিল ৮টি, অতফসিলভুক্ত ব্যাংক ছিল ১৩টি ও বিদেশি ব্যাংক ছিল ১টি। আর ব্যাংক শাখা/অফিসের সংখ্যা ছিল ৬৬৮টি। দেশ বিভক্তির পর ব্যাংকের অমুসলিম মালিকগণ দেশ ত্যাগ করেন। দেশ ত্যাগের সময় তারা ব্যাংকের সম্পদ এবং দক্ষ ব্যাংক কর্মচারীদের সাথে নিয়ে যায়। ফলে এঅঞ্চলের ব্যাংকিং সেক্টরে তীব্র শূন্যতার সৃষ্টি হয়। ১৯৪৯ সালে এ অঞ্চলে ব্যাংকের শাখা/অফিসের সংখ্যা কমে ১৪৮ টিতে দাঁড়ায়। এরপর বিভিন্ন ব্যাংক শাখা খুলে শূন্যতা পূরণের চেষ্টা করে। এ অঞ্চলের (পূর্ব পাকিস্তান) অধিবাসীদের দ্বারা ১৯৫৯ সালে ইস্টার্ন মার্কেন্টাইল ব্যাংক লি. এবং ১৯৬৫ সালে ইস্টার্ন ব্যাংকিং কর্পোরেশন লি. প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলশ্রুতিতে ১৯৭০ সালে এ অঞ্চলে ব্যাংকের শাখার সংখ্যা দাঁড়ায় ১০২৫টিতে। ১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীন হবার পর ব্যাংকের সম্পদের ওপর মালিকানা প্রতিষ্ঠা, উন্নয়নের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণ, বিভিন্ন সেক্টরের মধ্যে বৈষম্য দূরীকরণ, অর্থনীতির বিভিন্ন সেক্টরের ভারসাম্য উন্নয়ন, সর্বোপরি ব্যাংকিং সেবা জনসাধারণের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য বিদেশি ব্যাংক ব্যতীত সকল ব্যাংককে রাষ্ট্রায়ত্ত করে ছয়টি নতুন ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয়: সেগুলো হলো—সোনালী ব্যাংক, জনতা ব্যাংক, অগ্রণী ব্যাংক, রূপালী ব্যাংক, উত্তরা ব্যাংক ও পূবালী ব্যাংক। ব্যাংক সমূহ রাষ্ট্রায়ত্ত করার পর ব্যাংকিং সেক্টরের ব্যাপক সম্প্রসারণ হয়। ব্যাংকিং সেক্টরের সম্প্রসারণ কেবলমাত্র শাখার সংখ্যা বৃদ্ধি অর্থেই সম্প্রসারণ নয় বরং ব্যাংকিং কার্যক্রমেরও সম্প্রসারণ হয়। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকসমূহ সরকারের নির্দেশিত খাতে ঋণ প্রদান করত, লাভজনক না হওয়া সত্ত্বেও সরকারি নির্দেশে যত্রতত্র শাখা খুলতে হতো, কনসেশন হারে ঋণদান করত, ব্যাপক হারে নিয়োগ প্রদান করতে হতো। ফলে ব্যাংকের লাভ আশানুরূপ ছিল না। এ কারণে ১৯৮৩ সালে উত্তরা ব্যাংক ও ১৯৮৪ সালে পূবালী ব্যাংককে বিরাষ্ট্রীকরণ করা হয় এবং বেসরকারি খাতে ব্যাংক খোলার অনুমতি প্রদান করা হয়। ১৯৮৩ সালে বেসরকারি খাতে আরব বাংলাদেশ ব্যাংক লি. প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ বছর এবং এর পরবর্তী সময়ে বেসরকারি খাতে অনেক ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়।

ব্যাংকিংয়ের পথিকৃৎ

আধুনিক ব্যাংকিংয়ের পূর্বসূরী হিসেবে তিন শ্রেণির লোকের কথা বলা যায়—স্বর্ণকার, ব্যবসায়ী এবং মহাজন। আধুনিক ব্যাংক ব্যবসায়ের পূর্বসূরী হিসেবে ইংল্যান্ডের স্বর্ণকারদের নাম উল্লেখ করা যায়। ইংল্যান্ডের স্বর্ণকারগণ আর্থিক দিক থেকে বিত্তবান ছিল, নৈতিক দিক থেকে সৎ ছিল এবং সামাজিকভাবে বিশ্বাসী ছিল। তাই তখন সমাজের লোকজন তাদের স্বর্ণালংকার, মূল্যবান জিনিস, নগদ অর্থ স্বর্ণকারদের

কাছে জমা রাখত। স্বর্ণকারগণ মূল্যবান জিনিসের প্রাপ্তি স্বীকার করে রসিদ প্রদান করত এবং রসিদে বর্ণিত জিনিস চাহিবামাত্র পরিশোধ করার জন্য আমানতকারীকে বা রসিদের বহনকারীদের প্রদান করত। আবার আমানতকারীগণ চাহিবামাত্র পরিশোধ করার জন্য আমানতগ্রহীতা স্বর্ণকারের উপর লিখিত নির্দেশ দিত, যা স্বর্ণকারগণ মর্যাদা দান করত। আধুনিক কালের চেক-এর উৎপত্তি এখান থেকেই।

বাংলাদেশেও ব্যাংকিংব্যবস্থার উৎপত্তি সেই স্বর্ণকারদের হাত ধরে। চট্টগ্রাম শহর এবং গ্রামেগঞ্জের হাট-বাজারে স্বর্ণকারগণ শতাব্দীর পর শতাব্দি ধরে এ নীতি চালু করে ঋণ প্রদানের যে নীতি চালু করে রেখেছে আধুনিক ব্যাংকিং এর এ ডিজিটাল যুগেও তা বহাল তবিয়তে আছে। চট্টগ্রামের অপ্রাতিষ্ঠানিক এ ধারা অনেকটা বাধাগ্রস্ত হলেও চট্টগ্রামের অনকে অঞ্চলে স্বর্ণকারদের এ ব্যবসা পরিচালনায় খুব বেশি বেগ পেতে হচ্ছে না। ব্যাংকগুলো এখনো স্বর্ণালংকার বন্ধক রেখে লোন দিতে চায় না। আর যার কাছে স্বর্ণালংকার ছাড়া বন্ধক দেবার মতো কিছু নেই সে তো প্রয়োজনের তাগিদে স্বর্ণালংকার বন্ধক রেখে ঋণ নেওয়ার জন্য ঐ স্বর্ণকারের কাছেই যেতে বাধ্য।

আধুনিক ব্যাংক ব্যবসার পূর্বসূরী হিসেবে ব্যবসায়ীদের নামও উল্লেখযোগ্য। মধ্যযুগে পশ্চিম ইউরোপের ব্যবসায়ীগণ আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যে এত সচ্ছলতা ও খ্যাতি অর্জন করেছিল যে, তারা জনসাধারণের আস্থাভাজন হয়েছিল, যার কারণে জনসাধারণ তাদের কাছে অর্থ জমা রাখত। ব্যবসায়ীগণ এ অর্থের একাংশ ঋণের ব্যবসায়ে খাটাত।

বন্দরনগরী হওয়ার সুবাদে চট্টগ্রাম প্রাচীণকাল থেকে ব্যবসার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। ব্যবসায়ীদের কাছে অন্যরা পুঁজি খাটিয়ে নির্দিষ্ট হারে সুদ প্রাপ্তির যে ধারা পূর্বে ছিল, বর্তমানেও সে ধারা চালু রয়েছে। কোনো কোনো ব্যবসা প্রতিষ্ঠান হাজার কোটি টাকা পর্যন্ত আমানত গ্রহণ করে নির্দিষ্ট হারে সুদ প্রদান করে। এ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে ব্যবসা চালায় আবার জনসাধারণের কাছ থেকেও আমানত (জনগণের ভাষায় বিনিয়োগ) সংগ্রহ করে ব্যাংকের আমানতের সুদের হারের চেয়ে বেশি হারে। এ ব্যবস্থায় আমানতকারী ব্যাংকের আমানতের হারের চেয়ে বেশি হারে সুদ উপার্জন করতে পারে এবং এক সপ্তাহের জন্যও অর্থলগ্নী করতে পারে যা ব্যাংক করে না। অপর পক্ষে উক্ত আমানত গ্রহীতা ব্যাংকের ঋণের সুদের হারের চেয়ে কম সুদে টাকা পায় এবং ব্যাংকে বন্ধকী সম্পত্তি প্রদান ও পণ্যের স্টক বন্ধক রাখার মতো কঠিন বিষয়গুলোকে এড়াতে পারে। চট্টগ্রামের খাতুনগঞ্জে অনেক ব্যবসায়ী আবার ব্যাংক থেকে সি.সি. লোন নিয়ে সে লোনের টাকা দিয়ে অন্যদের ধার দেয় বেশি সুদের হারে। যে ব্যবসায়ী হঠাৎ করে পুঁজির সংকটে নিপতিত হয় সে ব্যবসায়ীর প্রয়োজন স্বল্প মেয়াদী ঋণ যেমন, এক সপ্তাহ কিংবা এক মাস। একটি ঋণ ব্যাংকে মঞ্জুর করাতেই কয়েক মাস সময় লেগে যায়। তাই ঐ ব্যবসায়ী দ্বারস্থ হন ঋণদাতা ব্যবসায়ীর কাছে। যে ব্যবসায়ীরা আধুনিক ব্যাংকিং এর পূর্বসূরী, আধুনিক ব্যাংকিং এর চরম উৎকর্ষতার যুগেও সে ব্যবসায়ীরা তাদের অপ্রাতিষ্ঠানিক ব্যাংকিং ধারা চালু রেখেছেন।

আধুনিক ব্যাংকিং এর অপর পথিকৃৎ হলেন মহাজনেরা। মহাজন শ্রেণির লোকজন অতি প্রাচীন কাল থেকেই ঋণ ও সুদের ব্যবসা করে আসছেন। এরা স্থায়ী সম্পত্তি বন্ধক রেখে ঋণ প্রদান করতেন এবং উচ্চ হারে সুদ আদায় করতেন। মধ্যযুগে মহাজন শ্রেণির লোকদের ঋণের কারবার ব্যাপকতা লাভ করেছিল।

চট্টগ্রামে মহাজন শ্রেণির ঋণ ও সুদের ব্যবসা স্বর্ণকার ও ব্যবসায়ীদের তুলনায় অনেক বেশি ব্যাপকতা পেয়েছিল। গ্রামে গঞ্জে সবচেয়ে বেশি প্রাধাণ্য লাভ করে মহাজনী পুঁজি। ছোট পরিসরে যে কেউ মহাজনী ব্যবসা করতে পারতো। জমির দলিল কিংবা মূল্যবান সম্পদ জমা রেখে মহাজনরা টাকা খাটাতো।

চট্টগ্রামে গ্রামেগঞ্জে স্বর্ণকাররাও মহাজনী সুদের ব্যবসা পরিচালনা করত যা এখনো বিদ্যমান। চট্টগ্রামের কোনো কোনো ব্যবসায়ীক অঞ্চলে হাতে গোনা কিছু মহাজন আছে তারা কোটি কোটি টাকা ঋণ দেয় ঋণগ্রহীতার পণ্য বন্ধক রেখে। মাঝির গুদামে ব্যবসায়ীদের রক্ষিত পণ্য মহাজনের কাছে বন্ধক রেখে স্বল্প সময়ের জন্য ঋণ পাওয়া যায় সহজে। মহাজনী সুদের যাঁতা কল থেকে জনসাধারণকে উদ্ধারের জন্য যে আধুনিক ব্যাংকিং এর উদ্ভব, ব্যাংকিং-এর উৎকর্ষতার এহেন সময়েও সে মহাজনরা টিকে আছে সমম্মানে।

ব্যাংকিংয়ে চট্টগ্রাম

৩০ জুন, ২০১২ ভিত্তিক তথ্য থেকে দেখা যায় চট্টগ্রামে ৪৫টি তফসিলী ব্যাংক ব্যবসায় রত যাদের মোট শাখার সংখ্যা ৭৫৭ এবং এডি শাখার সংখ্যা ১৫৮। আমানতের পরিমাণ ৬৩,৫৬২.৪৫ কোটি টাকা এবং ঋণ/অগ্রিমের পরিমাণ ৬৬,০০০.৪৯ কোটি টাকা, এর মধ্যে বিরূপ শ্রেণিকৃত ঋণের পরিমাণ ৩৭৬৪.৬৯ কোটি টাকা এবং বিরূপ শ্রেণিকৃত ঋণের হার ৫.৭০%। আমদানির পরিমাণ ৪২,৪০৯.৬৩ কোটি টাকা এবং রপ্তানির পরিমাণ ১৮,২৩৫.৯২ কোটি টাকা।

দেশের ব্যাংকগুলোর নিয়ন্ত্রক সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক কাজ করে যাচ্ছে। চট্টগ্রামে ব্যাংকগুলোকে নানামুখী সেবা দেবার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক চট্টগ্রামে একটা শাখা খোলে ১৯৪৮ সালের ১২ জুলাই, যা বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ বিভাগ হিসেবে পরিচিত। তবে এর পূর্ণাঙ্গ ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু হয় ১৫ জুলাই, ১৯৫২ সালে। এ শাখার আওতাধীন জেলাসমূহ হলো চট্টগ্রাম, খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, কক্সবাজার, ফেনী, নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর, কুমিল্লা, চাঁদপুর। চট্টগ্রাম অঞ্চলে সুষ্ঠু ব্যাংকিং ধারা প্রতিষ্ঠা, বিশেষ বিশেষ খাতে ঋণ প্রদানে উৎসাহ যোগানো এবং ব্যাংকগুলোকে পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক, চট্টগ্রাম বিশেষ অবদান রাখছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক, চট্টগ্রামের আওতায় ব্যাংকগুলোর কতিপয় তথ্য নিম্নরূপ

(কোটি টাকায়)

	সেপ্টেম্বর ২০১৫	সেপ্টেম্বর ২০১৬	সেপ্টেম্বর ২০১৭
মোট আমানত	১৩৫৫৪৮	১৯১৮১৭	২০৯১৮৯
মোট ঋণ	১০৩০২০	১৩১১৭৭	১৪৬০৩১
শ্রেণিকৃত ঋণ	৯৯০২	১৮৯৩৬	১৩৪৯৮
শ্রেণিকৃত ঋণের হার	৯.৬১%	১৪.৪৪%	৯.২৪%

সূত্র: বাংলাদেশ ব্যাংক, চট্টগ্রাম।

উক্ত টেবিলে লক্ষণীয় যে চট্টগ্রাম অঞ্চলে সেপ্টেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত মোট আমানত সংগ্রহের পরিমাণ হলো ২০৯১৮৯ কোটি টাকা এবং মোট ঋণ বিতরণের পরিমাণ হলো ১৪৬০৩১ কোটি টাকা যার মধ্যে ৯.২৪% খেলাপি অর্থাৎ ১৩৪৯৮ কোটি টাকা। এতদ্অঞ্চলে সেপ্টেম্বর ২০১৫ তে খেলাপির পরিমাণ ছিল ৯.৬১ শতাংশ এবং সেপ্টেম্বর ২০১৬ তে খেলাপির পরিমাণ ছিল ১৪.৪৪ শতাংশ। সেপ্টেম্বর ২০১৬ এর তুলনায় সেপ্টেম্বর ২০১৭ তে ৫.২০ শতাংশ কমলেও তা আন্তর্জাতিক মানের প্রায় দ্বিগুণ। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায়, ২০১৭ সালের সেপ্টেম্বর শেষে দেশে খেলাপি ঋণের হার দাঁড়ায় ১০.৬৭ শতাংশ। জাতীয়ভাবে খেলাপি ঋণের চেয়ে চট্টগ্রামে ১.৪৩ শতাংশ কম হলেও এ হার একটি সুস্থ অর্থনীতির পরিচায়ক হতে পারে না।

উন্নয়নশীল দেশগুলোর কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, খেলাপি ঋণের হার ২ শতাংশের নিচে রয়েছে এশিয়ার সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, চীন ও ফিলিপাইনের। ২০১৭ সালের সেপ্টেম্বর শেষে এশিয়ার বিভিন্ন দেশের খেলাপি ঋণের হার নিম্নরূপ—

সিঙ্গাপুর: ১.২, মালয়েশিয়া: ১.৬, চীন: ১.৭, ফিলিপাইন: ১.৯, থাইল্যান্ড: ২.৯, ভিয়েতনাম: ২.৫, ইন্দোনোশিয়া: ২.৯, কম্বোডিয়া: ২.৫, শ্রীলংকা: ২.৬ এবং ভারত: ৯.৩ শতাংশ।

এশিয়ার অপরাপর দেশের খেলাপি ঋণের চিত্র দেখে সহজে অনুমান করা যায় যে ভারতের কথা বাদ দিলে অন্যান্য দেশের চেয়ে আমাদের অবস্থান কত তলানিতে আছে।

বর্তমানে সারা দেশে ৮ লাখ কোটি টাকা ঋণের মধ্যে ১ লাখ ১১ হাজার কোটি টাকা খেলাপি। আর চট্টগ্রামের ব্যবসায়ীদর কাছে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের খেলাপি ঋণের পরিমাণ প্রায় ১৫ হাজার কোটি টাকা। ভোগ্যপণ্য, ইস্পাত, কৃষি, আবাসন সহ বিভিন্ন খাতের প্রতিষ্ঠান এ খেলাপি তালিকায় থাকলেও সবার উপর রয়েছে ইস্পাত খাত। এ অঞ্চলে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের খেলাপি ঋণের প্রায় ৪০ শতাংশই রয়েছে ইস্পাত খাতে।

চট্টগ্রাম যেহেতু দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের দ্বিতীয় প্রাণশক্তি সেহেতু যেকোনো ব্যাংকের প্রথম শাখাটি ঢাকায় স্থাপিত হলে দ্বিতীয় শাখাটি চট্টগ্রামে স্থাপিত হওয়ার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। চট্টগ্রামের ভৌগোলিক অবস্থানগত সুবিধার কারণে এখানে কিছু কিছু ব্যবসা বা শিল্প গড়ে উঠেছিল যা সারা দেশের চাহিদার জোগানদাতা। ভোজ্য তেল ব্যবসা এবং এর পরিশোধনের জন্য স্থাপিত পরিশোধন কারখানা চট্টগ্রামের একটা মৌলিক ব্যবসা যা এখনো সারা দেশের ভোজ্য তেল ব্যবসায় নেতৃত্ব দিচ্ছে। সঙ্গত কারণে প্রচুর পুঁজি লাগে এ ব্যবসায় এবং ব্যাংক-ঋণও দেওয়া হয়েছে উল্লেখযোগ্য পরিমাণের। এস. আলম গ্রুপ, ইলিয়াছ ব্রাদার্স, এমইবি ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স, মোস্তফা গ্রুপ, এইচ আর গ্রুপ, নুর জাহান গ্রুপ, এস এ গ্রুপ, সিটি গ্রুপ, টিকে গ্রুপ ইত্যাদি ভোজ্য তেল ব্যবসা করে আসছে দীর্ঘদিন যাবৎ। এ গ্রুপগুলোর মধ্যেই রয়েছে চট্টগ্রামের সরবরাহকৃত ঋণের সিংহভাগ। আবার এ ভোজ্য তেল খাতেই খেলাপি ঋণের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি।

চট্টগ্রামে অপর যে মৌলিক খাতটি ব্যাংক ঋণের প্রবাহে বড় ভূমিকা রাখে সেটি হলো জাহাজ ভাঙা শিল্প। শুধু এ সেক্টরে বিনিয়োগ করার জন্য সীতাকুন্ড, বারবকুন্ড এলাকায় প্রতিষ্ঠা পেয়েছে অনেকগুলো ব্যাংক শাখা। বিশ্বে জাহাজ ভাঙা শিল্পের অন্যতম দেশ বাংলাদেশ। ৬০-এর দশকের দিকে চট্টগ্রামের সীতাকুন্ডে সাগর উপকূলে জাহাজ ভাঙা ব্যবসার শুরু। আর আশির দশকের দিকে এ ব্যবসা বিকশিত হতে থাকে। সীতাকুন্ডে প্রায় ১৬০টি ইয়ার্ড রয়েছে। এর মধ্যে ৪০ থেকে ৫০টি ইয়ার্ডে নিয়মিত জাহাজ ভাঙা হয়। এ শিল্পে বর্তমানে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ১০ লক্ষ শ্রমিকের কর্মসংস্থান রয়েছে। এ শিল্পের উন্নয়নের জন্য ব্যাংকগুলো এগিয়ে এসেছে। ফলে নতুন নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি হয়েছে। পরিত্যক্ত জাহাজ ভেঙে এর থেকে লৌহজাত দ্রব্যাদি সরবরাহ করা হচ্ছে দেশের লৌহজাত শিল্পে। দেশে লোহা জাতীয় কাঁচামালের চাহিদা ৪০ থেকে ৪৫ লক্ষ টন। এর মধ্যে ২৫ থেকে ৩০ লক্ষ টন জোগান দেওয়া হচ্ছে জাহাজ ভাঙা শিল্প থেকে। আর এ কাঁচামাল প্রাপ্তির সহজলভ্যতার ওপর ভিত্তি করে দেশে গড়ে উঠেছে অসংখ্য রি-রোলিং ও ষ্টিলস মিলস। পুরাতন জাহাজ আমদানিতে ব্যাংকগুলো বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে ঋণ দিয়েছে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ। জাহাজ ভাঙা শিল্পে ঋণের প্রয়োজন হয় প্রচুর। এক একটি জাহাজের জন্য এক'শ থেকে দু'শ কোটি টাকা পর্যন্ত ঋণ লাগে। তাই ব্যবসায়ীরা ঋণের বিপরীতে পর্যাপ্ত সহায়ক জামানত দিতে পারেন না। প্রায় ব্যাংক তাই সহায়ক জামানতের ব্যাপারে ছাড় দিয়ে ব্যবসা করেছিল।

ব্যবসায় যখন মন্দা নেমে আসে তখন অনেক ব্যবসায়ীর ঋণ খেলাপি হয়ে পড়ে এবং অনেক ব্যাংক বিপদে পড়ে যায়। হালে কিছু ব্যবসায়ী দায় দেনার চাপে লোক চক্ষুর অন্তরালে চলে যায়। ফলে এ অনন্য খাতটি ব্যাংকারদের দৃষ্টিতে হয়ে পড়েছে বিপদসংকুল। দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা নিয়ে সরকার এগিয়ে না আসলে এ মৌলিক খাতটি বিপন্ন হবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

ব্যাংকিংয়ে বিশেষ ঝুঁকি

ব্যাংকিং সব সময়ই ঝুঁকিপূর্ণ ব্যবসা। ঝুঁকি পরিহার করা কিংবা কমিয়ে এনে ব্যবসা করার জন্য ব্যাংকারদের চেষ্টার অন্ত নেই। ব্যাংকাররা সাধারণত যেসব ঝুঁকির বিপরীতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকেন তা হলো:

(ক) শিল্পের ক্ষেত্রে যোগানের ঝুঁকি এবং বিক্রয় ঝুঁকি।
(খ) কোম্পানির ক্ষেত্রে পরিচালন ঝুঁকি, রেজিলিয়েন্স ঝুঁকি, ব্যবস্থাপনার দক্ষতা ঝুঁকি এবং ব্যবস্থাপনার সততার ঝুঁকি।
(গ) সিকিউরিটির ক্ষেত্রে. সিকিউরিটির নিয়ন্ত্রণ ঝুঁকি এবং সিকিউরিটির পর্যাপ্ততা ঝুঁকি।

এসব ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় ব্যাংকগুলো হরেক রকমের নতুন নতুন উপায় অবলম্বন করছে। কিন্তু এর বাইরেও নানা অপ্রাতিষ্ঠানিক ঝুঁকি থাকে যেগুলো পরোক্ষভাবে ব্যাংকগুলোকে গভীর সংকটে ফেলছে। চট্টগ্রামে এ ধরনের কিছু অপ্রাতিষ্ঠানিক ঝুঁকি বাজারে বিদ্যমান যেগুলো দীর্ঘদিন ধরে ব্যাংকগুলোকে সমস্যায় ফেলছে যেমন:

১. খাতুনগঞ্জের অপ্রাতিষ্ঠানিক ঋণের বাজার—টু-টু ।
২. অতিরিক্ত ডিও ইস্যুর চাতুরী।
৩. দেশান্তরী হওয়া।

১. খাতুনগঞ্জের অপ্রাতিষ্ঠানিক ঋণের বাজার—টু-টু

মহাজনি প্রথার আধুনিক একটি রূপ টু-টু প্রথা। চট্টগ্রামের খাতুনগঞ্জেই এর উৎপত্তি এবং বিকাশ। এ প্রথা প্রাতিষ্ঠানিক ব্যাংকিং এর জন্য একটা বড় হুমকি। আধুনিক ব্যাংকিং পদ্ধতির সীমাবদ্ধার কারণে খাতুনগঞ্জে গড়ে উঠেছে টু-টু পদ্ধতি। মহাজনি প্রথাটা খাতুনগঞ্জের আদি প্রথা হলেও এর আধুনিক সংস্করণ হলো টু-টু পদ্ধতি। নগদ অর্থের তাৎক্ষণিক প্রয়োজন মেটাতে এ পদ্ধতি বেশ জনপ্রিয়।

টু-টু পদ্ধতি ব্যাপক প্রসার লাভ করে আশির দশকে। নগদ অর্থের তাৎক্ষণিক প্রয়োজন মেটাতে ব্যবসায়ী বা মহাজন কর্তৃক চড়া সুদে কোনো জামানত ছাড়া শুধু ভবিষ্যতে পরিশোধ্য চেকের বিনিময়ে যে ঋণ দেওয়া হয় তাকে টু-টু পদ্ধতি বলা হয়। এ পদ্ধতির কয়েকটি ধরন রয়েছে। যেমন সিঙ্গেল বার-টু-বার , ডাবল বার-টু-বার ও মাস-টু-মাস।

সপ্তাহের যেদিন ঋণটি নেওয়া হয় পরবর্তী সপ্তাহের সে দিনেই পরিশোধ্য পদ্ধতির নাম হলো বার-টু-বার। দুই সপ্তাহের জন্য ঋণটি নেওয়া হলে তাকে বলে ডাবল বার-টু-বার। সে রকম যদি কোনো মাসের যে তারিখে নগদ অর্থ ধার হিসাবে নেওয়া হয় এবং তা যদি সুদসহ আসল পরবর্তী মাসের সে তারিখেই পরিশোধ্য হয়, সে পদ্ধতিটিকে মাস-টু-মাস পদ্ধতি বলা হয়।

টু-টু প্রথায় যারা ধার দেয় তারা মূলত মহাজন শ্রেণি। তবে এ প্রথার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি এবং লাভজনক হওয়ায় অনেক ব্যবসায়ীও এ প্রথায় তাদের পুঁজি বিনিয়োগ করে মহাজনি কায়দায়। অর্থ ধার দেওয়ার ক্ষেত্রে বিশ্বাসই মূল ভিত্তি। এরপরও ঋণগ্রহীতার আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করে কোনো কোনো ক্ষেত্রে চেক জামানত রাখা হয় অর্থাৎ বার টু বার হলে নির্ধারিত পরিশোধ্য তারিখের চেক জমা নেওয়া হয়। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে চেকের ওপরও আস্থা রাখতে না পারলে তখন গুদামে রক্ষিত মালামাল বন্ধক রেখে টাকা ধার দেওয়া হয়। কেউ কেউ তেল কিংবা চিনির ডিও (ডেলিভারী অর্ডার) জমা রেখেও টাকা ধার দেন।

সুদের হার নির্ধারণে টু-টু প্রথার রয়েছে একটি অভিনব পদ্ধতি। এক মন ভোজ্য তেলের দাম ১১০০ টাকা ধরে আসল ঋণ হিসাব করা হয়। এক ট্রাকে ১৫০ মন ভোজ্য তেল সরবরাহ করা হয়। সে হিসাবে এক ট্রাক ভোজ্য তেলের ডিও এর মূল্য ১৬৫,০০০/- টাকা ধরা হয়। বাজারে ভোজ্য তেলের দাম ২২০০ টাকা হলেও টু-টু তে লেনদেনের সময় ঐ ১১০০ টাকাই ধরা হয়। কেউ টু-টু মানি মার্কেট থেকে ঋণ নিতে চাইলে এক ট্রাক তেলের মূল্য অর্থাৎ ১৬৫,০০০ টাকা নগদ গ্রহণ করার বিনিময়ে এক মাস পর এর সুদ প্রদান করতে হয় ২৭০০ টাকা পর্যন্ত। অর্থাৎ প্রায় ২০ শতাংশ হারে সুদ প্রদান করতে হয়। যে সময়ে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ব্যবসায়িক ঋণের সুদের হার ছিল সর্বোচ্চ ১২ শতাংশ।

১.১ টু-টু ব্যবসার প্রসারের কারণ

ক) সহজ শর্তে এবং তাৎক্ষনিক নগদ অর্থ পাওয়ার জন্য টু-টু প্রথার জুড়ি নেই। চাহিবা মাত্র এ ঋণ পাওয়া যায়, যদি বাজারে ঋণ গ্রহীতার সুনাম বিদ্যমান থাকে।

খ) ব্যাংকগুলো সাধারণত কোলেটারেল সিকিউরিটি ছাড়া ঋণ দেয় না। যে ব্যবসায়ীর কোনো কোলেটারেল সিকিউরিটি নেই তিনি স্বল্প কালের জন্য নগদ অর্থের সংকটে পড়লে তার জন্য টু-টু প্রথাই একমাত্র ভরসা।

গ) বাণিজ্যিক ব্যাংকে ঋণ মঞ্জুর করতে দু'তিন মাস সময় লেগে যায়। এ সময়ের আগেই যদি ঋণের প্রয়োজন হয় তখন ব্যবসায়ীরা টু-টু বাজারে যেতে বাধ্য হন।

ঘ) ব্যবসায়ীর ব্যাংকে ঋণের লিমিট মঞ্জুর করা থাকলেও এক সাথে তার অনেকগুলো আমদানি ডকুমেন্ট ব্যাংকে উপস্থাপিত হলে তখন অতিরিক্তি ঋণের প্রয়োজন হয়। ব্যাংক এ অতিরিক্ত ঋণ মঞ্জুর না করলে তাকে বাধ্য হয়ে টু-টু বাজার থেকে ঋণ সংগ্রহ করে ডকুমেন্ট ছাড় করতে হয়।

ঙ) ব্যাংকে ঋণ নবায়নের সময় ঋণের সুদ প্রদান করা, ব্যাংকের বার্ষিক ও অর্ধবার্ষিক ক্লোজিং এর সময় ঋণ পরিশোধ করা কিংবা ঋণ পুনঃতফসিল করার সময় ব্যবসায়ীদের নগদ অর্থের প্রয়োজন হয়। তখন টু-টু বাজার থেকে ঋণ সংগ্রহ করাই সবচেয়ে সহজ।

খাতুনগঞ্জে মহাজনী অর্থ বাজার তথা টু-টু প্রথায় কী পরিমাণ অর্থের পরিচালন ঘটে তা হিসাব করা দুঃসাধ্য হলেও ব্যবসায়ীদের মতে এ পদ্ধতিতে দৈনিক প্রায় ১০০ কোটি টাকার লেনদেন হয়। এ বাজারের প্রসারতা নিঃসন্দেহে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর জন্য একটা বড় হুমকি।

১.২ টু-টু পদ্ধতিতে ব্যাংকের জন্য ঝুঁকি

যেসব মহাজন কিংবা ব্যবসায়ী টু-টু প্রদ্ধতিতে টাকা খাটায় তারা প্রথমে নিজের পুঁজির ওপর ভর করে এ ব্যবসা পরিচালনা করেন। পরবর্তীতে অর্থের চাহিদা বেড়ে গেলে তখন এ চাহিদা মেটানোর জন্য

ব্যাংকের দ্বারস্থ হন। ব্যাংক থেকে নানা উপায়ে লোন নিয়ে তা অধিক সুদে টু-টু ব্যবসায় খাটায়। যেহেতু টু-টু ব্যবসা বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত তাই এতে ঝুঁকি রয়েছে প্রচুর। অনেক সময় টু-টু বাজার থেকে ঋণ নিয়ে ঋণ গ্রহীতা দেউলিয়া হয়ে যায় কিংবা বাজার থেকে উৎখাত হয়ে যায়। এ পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য ঋণদাতার কোনো উপায় থাকে না। ফলে অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ বাড়তে থাকে। এক সময় সে নিজেও দেউলিয়া হয়ে যায় এবং ব্যাংক তাকে দেওয়া ঋণ আদায় করতে পারে না অর্থাৎ ব্যাংকের খেলাপি ঋণ বেড়ে যায়। ১৯৮৬ সালে বিভূতিভূষণ নামে এক ব্যবসায়ী ৬ কোটি টাকা বকেয়া রেখে ভারতে পালিয়ে যায়। এর পরই এ ব্যবসার ঝুঁকি প্রতিভাত হয় । বিভূতিভূষণ পালিয়ে যাওয়ার কারণে তার সাথে দেনাপাওনা আছে এমন অনেক ব্যবসায়ীও সংকটে পড়ে যায়। ধারণা করা হয় যে এখন পর্যন্ত এভাবে ঘটে যাওয়া শতাধিক ঘটনায় কয়েক হাজার কোটি টাকার প্রতারণা হয়েছে খাতুনগঞ্জে। যে কারণে ব্যাংকগুলোও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।

২. অতিরিক্ত ডিও ইস্যুর চাতুরি

চট্টগ্রামের খাতুনগঞ্জে যে সব লেনদেন হয় তার বেশির ভাগই ডিও এর মাধ্যমে হয়। ভোগ্যপণ্য, ভোজ্যতেল ও চিনি'র ব্যবসা পরিচালনায় ডিও পদ্ধতির আশ্রয় নেওয়া হয়। যে সব ব্যবসায়ী আমদানি ব্যবসার সাথে জড়িত তাদের পণ্যের বিপরীতে বিক্রয়ের দলিল হিসাবে ডিও ইস্যু করে থাকেন। ক্রেতারা ঐ ডিও হাতে ধরে রাখেন ভবিষ্যতে দাম বৃদ্ধির সুযোগ নেওয়ার জন্য। ঐ ডিও এর মালামাল ডেলিভারি নেওয়ার আগে ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে অনেক জনের হাতে হস্তান্তরিত হয়। আমদানিকারক ছাড়াও ভোজ্য তেলের স্থানীয় উৎপাদনকারীরাও এ ডিও ইস্যু করে থাকেন। যখন ডিও ইস্যুকারীর অধিক অর্থের প্রয়োজন হয় তখন তিনি প্রকৃত স্টকের অতিরিক্ত স্টকের বিপরীতে ডিও বিক্রি করে বাজার থেকে নগদ অর্থ তুলে নেন। যারা ডিও ক্রয় করেন তারা সবাই সাথে সাথে মাল ডেলিভারী গ্রহণ করেন না। এ সুযোগটাকে কাজে লাগায় ডিও ইস্যুকারীরা। সব ডিও এর মাল যদি এক সাথে ডেলিভারী নেওয়ার জন্য ক্রেতারা হাজির হয় তখন ডিও ইস্যুকারীর প্রকৃত স্টকের অবস্থা বুঝা যাবে। ডিও ব্যবসার প্রসার হবার কারণে এ ধরনের প্রতারণামূলক অতিরিক্ত ডিও বাজারে ছাড়ার মাধ্যেমে অতিরিক্ত পণ্য মূল্য বাজার থেকে সংগ্রহ করা অপ্রাতিষ্ঠানিক অর্থ বাজারে একটি অন্যতম অনুষঙ্গ হিসেবে দাঁড়িয়েছে। খাতুনগঞ্জে ভোজ্য তেল ব্যবসায় নিয়োজিত যে সব প্রতিষ্ঠানের ডিও ক্রয় বিক্রয় হতো সে সব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠানগুলো হলো :

ক) টি কে অয়েল মিল, খ) মোস্তফা ভেজিটেবল অয়েল মিল, গ) মোহাম্মদ ইলিয়াছ ব্রাদার্স ঘ) শাহআমানত ভেজিটেবল, ঙ) ইয়াকুব অয়েল মিল, চ) এম রহমান বনস্পতি, ছ) আলহাজ্ব অয়েল মিল, জ) রাসেল ভেজিটেবল, ঝ) এস আলম ভেজিটেবল অয়েল মিল ইত্যাদি।

উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে বেশির ভাগই সংকটে নিপতিত এবং ইতিমধ্যে ডিও ক্রেতাদের আস্থা হারিয়েছে। চিনির বাজারে ডিও ব্যবসায় বর্তমানে সিটি গ্রুপ এবং এস আলম সুগার মিল অত্যন্ত শক্ত অবস্থায় আছে।

অতিরিক্ত ডিও ইস্যু করার পর ইস্যুকারী প্রতিষ্ঠান সংকটে পড়ে গেলে অতিরিক্ত ডিও এর বিপরীতে মালামাল সরবরাহ করা যায় না। যে সব ব্যবসায়ী ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে ঐ অতিরিক্ত ডিও ক্রয়ের জালে জড়িয়ে যান ঐ প্রতিষ্ঠান সংকটে পড়ার সাথে সাথে তারাও সংকটে নিপতিত হন। ফলে ব্যাংকের ঋণও তারা আর শোধ করতে পারেন না।

৩. দেশান্তরী হওয়া

চট্টগ্রামের ব্যাংকিংয়ে অন্য একটা বড় ঝুঁকি হলো ঋণগ্রহীতার দেশান্তরী হওয়া। দেনার ভারে জর্জরিত হয়ে ঋণগ্রহীতা স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি রেখে বা বিক্রি করে বিদেশে পালিয়ে যাওয়ার ঘটনা নিয়মিতভাবে ঘটছে। ১৯৯০-এর দশকের গোড়ার দিকে রাজগরিয়া পরিবার দেশে প্রচুর দেনা রেখে ভারতে পালিয়ে যাওয়ার ঘটনায় কয়েকটি ব্যাংক প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পরবর্তী সময়ে চট্টগ্রামের অনেক ব্যবসায়ী কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া ও সংযুক্ত আরব আমিরাতে পালিয়ে যান। এদের ব্যাংকঋণের পরিমাণ প্রায় ছয় হাজার কোটি টাকা, যা দীর্ঘদিন ধরে খেলাপি হয়ে আছে।

ব্যাংকের ঋণ অনাদায়ী রেখে বিদেশে সপরিবারে পালিয়ে গেলে ঐ ঋণ আদায়ের জন্য অর্থঋণ আদালতে মামলা করা যায়। কিন্তু বন্ধকী সম্পত্তি নিলাম বিক্রয় করে দেনা যদি সম্পণ পরিশোধ না হয়, বাদ বাকি পাওনা আদায়ের জন্য ব্যাংকের হাতে কোনো হাতিয়ার থাকে না। অর্থঋণ আদালত আইন-২০০৩-এ এই ঋণ আদায়ের ব্যাপারে কোনো দিকনির্দেশনা নেই। বিদেশে পালিয়ে যাওয়া ঋণ গ্রহীতার ঋণ আদায়ের ব্যাপারে অর্থঋণ আদালত আইনে কোনো ধারা না থাকাটা অর্থঋণ আদালত আইন-২০০৩ এর বড় সীমাবদ্ধতা। দেশ থেকে যে কেউ দেশান্তরী হতে পারে, কিন্তু দেশান্তরী হওয়ার ঘটনা চট্টগ্রামেই যেহেতু বেশি, তাই দেশান্তরী হওয়ার বিষয়টি চট্টগ্রামের ব্যাংকিংয়ের জন্য একটা বিশেষ ঝুঁকি হিসেবে চিহ্নিত।

সমস্যা ও সুপারিশ

চট্টগ্রাম দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম নগরী। এটি ঢাকার চেয়ে প্রাচীনতম শহর। আইনগতভাবে বৈধতা না পেলেও এটি দেশের বাণিজ্যিক রাজধানী হিসেবে পরিচিত। আর তাই দেশের ব্যাংকব্যবস্থায় ঢাকার পর চট্টগ্রামকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। যেহেতু এটা দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের প্রাণকেন্দ্র তাই একটি শক্তিশালী ব্যবসায়ী শ্রেণি গড়ে উঠেছে চট্টগ্রামে। আর ব্যাংকের সবচেয়ে বেশি ঋণ ব্যবহারকারী হলো এ ব্যবসায়ীরা। একটি শক্তিশালী ব্যাংকিংব্যবস্থাই নিশ্চিত করতে পারে উন্নয়ন। চট্টগ্রামে ব্যাংকিং-এর সমস্যাগুলোর প্রতি একটু আলোকপাত করা যাক:

১. ব্যবসায় পণ্যমূল্যের ওপর সরকারি যুতসই নিয়ন্ত্রণ না থাকায় সৃষ্টি হয় অসুস্থ প্রতিযোগিতা। এ অসুস্থ প্রতিযোগিতায় প্রতিবছর সত্যিকার অর্থে অসুস্থ হয়ে বাজার থেকে বিদায় নেয় ডজন ডজন ব্যবসায়ী। ফলে তাদের নেওয়া ঋণ খেলাপি হয়ে পড়ে। আবার কিছু কিছু মেগা ব্যবসায়ী জামানতহীনভাবে শত কোটি টাকার ঋণ পেয়ে যান সহজে। তাদের এ পুঁজি লাগানো হয় পণ্য মূল্য হ্রাস করা কিংবা নিয়ন্ত্রণে। পণ্যমূল্য পড়ে গেলে মুহূর্তেই অতল গহ্বরে পড়ে যান ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা। ফলে তাদের ঋণ হয়ে পড়ে অনাদায়ী। ব্যাংকের দেওয়া অযাচিত ও সস্তা পুঁজি বাজারে নেতিবাচক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়।

২. বাজারে চাহিদার চেয়ে আমদানিকৃত পণ্যের জোগান বেড়ে গেলে বাজারে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। পণ্যের মূল্য কমতে থাকে। আর তখন কে আগে পণ্য বিক্রি করে আপদ থেকে বেরিয়ে পড়বে সে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হন। এ প্রতিযোগিতায় অপেক্ষাকৃত দুর্বল পুঁজির ব্যবসায়ীরা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দুর্বলতা তাদের দুর্বলতর হয়। ঋণ হয় খেলাপি। অথচ পণ্যের জোগান সরকারিভাবে নিয়ন্ত্রণ করা গেলে বাজারে স্থিতিশীলতা বজায় রাখা সম্ভব হয়। আর ব্যবসায়ীরা লোকসানের সম্মুখীন হলেও অন্তত পথে বসে না। চালের দাম বেড়ে গেলে তা কমানোর জন্য সরকারি কর্মকর্তারা যেভাবে মাঠে ময়দানে নেমে পড়েন, অন্যান্য পণ্যের ক্ষেত্রে এ প্রচেষ্টা

থাকে না কেন? এ প্রচেষ্টাটা যদি সকল পণ্যের জন্য অব্যাহত থাকে সিন্ডিকেট ব্যবসার যাঁতা কলে পিষ্ট ব্যবসায়ীদের নাভিশ্বাস হয় না, ঋণও সহজে খেলাপি হয় না।

৩. চট্টগ্রামের ব্যাংকিং এর আরেকটি দুর্বল দিক হলো এখানে বড় ব্যবসায়ীরা বড় অংকের ঋণ পেয়ে যায় কোনো কোলেটারাল ছাড়াই। আর ছোট ব্যবসায়ীরা ছোট অংকের ঋণ পায় ঋণের অংকের দ্বিগুণ কোলেটারাল দিয়ে। আবার বড় ব্যবসায়ীরা কম সুদের হারে ঋণ পায়, কিন্তু ছোট ব্যবসায়ীদের দিতে হয় সর্বোচ্চ হারের সুদ। এক্ষেত্রেও পণ্য মূল্যের ক্ষেত্রে ছোট ব্যবসায়ীরা বড় ব্যবসায়ীদের কাছে মার খাচ্ছে প্রতিদিন, প্রতিনিয়ত। নিঃস্ব হচ্ছে ছোট ও মাঝারি ব্যবসায়ীরা। ঋণ খারাপ হওয়ার পেছনে এটাও একটা বড় কারণ।

৪. চট্টগ্রামের বড় ব্যবসায়ীরা একই সাথে কয়েকটা ব্যাংক থেকে ঋণ মঞ্জুর করে রাখেন। একটি ব্যাংকে একটা ঋণ অনাদায়ী থাকলে তা খেলাপি হিসেবে চিহ্নিত হবার আগেই অন্য একটি ব্যাংক থেকে ঋণের টাকা এনে তা পরিশোধের ব্যবস্থা করা হয়। শরীরের রোগের লক্ষণের ওপর এভাবে দেওয়া হয় মরীচিকাময় প্রলেপ। তাতে রোগ গভীর থেকে গভীরতর হয়, লক্ষণকে প্রকাশ করতে দেওয়া হয় না। অপর দিকে ছোট ও মাঝারি ব্যবসায়ীদের একটি ব্যাংকে একটি ঋণই থাকে। কোনো যৌক্তিক কারণে সে ঋণটি অনাদায়ী হলেই তার সি আই বি খারাপ, পারফরম্যান্স খারাপ, সুনাম খারাপ - শেষ পর্যন্ত হয় তার অগ্রস্ত্যযাত্রা।

৫. দেশে একটি পণ্যের কতটুকু চাহিদা আছে তার হিসাব সরকারের কাছে থাকে। সে অনুযায়ী শিল্প কারখানা স্থাপনের অনুমতি দেওয়া উচিত। যেমন সারা দেশে কাগজের চাহিদা অনুযায়ী যে পরিমাণ কাগজের মিল থাকা দরকার সরকার যদি এর দ্বিগুণ পরিমাণ কাগজের মিল স্থাপনের জন্য অনুমতি দেয় তাহলে পুরো কাগজ শিল্পটাই লোকসানে পড়ে ধ্বংস হয়ে যাবে, উদ্যোক্তরাও পথে বসবে। তেমনি ব্যাংক যখন শিল্প স্থাপনে ঋণ মঞ্জুর করে তখন বর্তমান চাহিদা এবং জোগান কতটুকু আছে তা নির্ণয় করে নতুন শিল্পে ঋণ মঞ্জুরের সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত - কোলেটারাল সিকিউরিটি যত বেশিই হোক না কেন। বাস্তবে এ নিয়মাচার মানা হয় না। বেশকিছু শিল্প কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে ব্যাংকারদের এ বেহিসাবী মঞ্জুরীর কারণে এবং সরকারের কোনো ধরনের নিয়ন্ত্রণ না থাকার কারণে।

৬. এভাবে সারা দেশের ন্যায় চট্টগ্রামেও অনেক ব্যবসায়ী ব্যবসা থেকে উৎখাত হয়ে গেছেন এবং খেলাপি হয়ে পড়েছে তাদের কোটি কোটি টাকার ঋণ। কেউ কেউ বলে থাকেন চট্টগ্রামের ব্যবসায়ীদের কারণে দেশের খেলাপি ঋণ বেড়ে গেছে এবং অর্থনীতিতে একটি নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। আসলে এক্ষেত্রে চট্টগ্রামকে আলাদাভাবে বেশি দোষারোপ করার জো নেই। চট্টগ্রামের ব্যবসায়ীরা অর্থনীতিতে বড় অবদান রাখছেন। বড় উদ্যোক্তা বলে বড় ঋণ গ্রাহকও তারা। খেলাপি হওয়ার কারণে বড় ঋণটা সহজে চোখে পড়ে। তার মানে এই নয় যে চট্টগ্রামেই খেলাপি ঋণ বেশি। আসলে এটা চট্টগ্রামের সমস্যা নয়, জাতীয় সমস্যা। এ সমস্যাকে মোকাবিলা করার জন্য গ্রাহক-ব্যাংকার-সরকার এ ত্রিপক্ষিয় সমঝোতার বিকল্প নেই। মরা গাছেও ফুল ফোটে–তাই চেষ্টাটা তো করে যেতে হবে!

উপসংহার

অর্থনীতিতে চট্টগ্রাম যে অবদান রেখে যাচ্ছে তার চেয়ে অনেক বেশি অবদান রাখার সম্ভাবনা ও সুযোগ রয়েছে। তাছাড়া নিম্নমধ্য আয়ের দেশে উত্তোরণের পর যে সব আর্থিক ঝুঁকির চ্যালেঞ্জ রয়েছে তা মোকাবিলা করার জন্য চট্টগ্রামকে প্রকৃত অর্থেই বাণিজ্যিক রাজধানী হিসেবে গড়ে তোলা দরকার এবং চট্টগ্রামের ব্যাংকিং-এর সমস্যাবলীকে দূরীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি। জাতীয় অর্থনীতিতে বন্দরনগরী চট্টগ্রামের গুরুত্ব অপরিসীম। এর ভৌগোলিক অবস্থান শুধু দেশের জন্য নয় আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলেও এর গুরুত্ব অনস্বীকার্য। উপমহাদেশ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মধ্যে আঞ্চলিক যোগাযোগের যুগসূত্র হতে পারে এ চট্টগ্রাম। এছাড়াও ভারত, মায়ানমার, নেপাল, ভুটান এবং দক্ষিণ-পূর্ব চীনের আঞ্চলিক ট্রান্সশিপম্যান্ট হাব হতে পারে এ চট্টগ্রাম। অর্থনীতির স্বর্ণদ্বারের পরিকল্পিত পন্থায় উন্নয়নের মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্য আয়ের দেশে উন্নীত হওয়া এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত হওয়া সম্ভবপর হতে পারে। বর্তমানে দেশের শিল্পোৎপাদনের ৪০%, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ৮০% এবং সরকারের রাজস্ব আয়ের ৫০% এ চট্টগ্রামের অবদান।

অপার সম্ভাবনার দেশ বাংলাদেশ। চট্টগ্রাম সে সম্ভাবনার পথে ইঞ্জিন অব গ্রোথ। চট্টগ্রামের উন্নয়নের জন্য সরকার যে মহা পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে ব্যাংকিং খাতটিকে বিশুদ্ধ করার পরিকল্পনাও এর অন্তর্ভুক্ত করা বাঞ্চণীয়। ব্যবসায়ী-উদ্যোক্তা শ্রেণিকে যেভাবে হোক বাঁচিয়ে রাখা আবশ্যক। চট্টগ্রামের ব্যবসায়ী যারা লোকসানে পড়ে ইতিমধ্যে ব্যবসা বিমুখ হয়ে পড়েছেন তাদের প্রণোদনার ব্যবস্থা করে ব্যাংকিং সুযোগসুবিধায় কীভাবে তাদের অন্তর্ভূক্ত করা যায় সে চিন্তা করার এখনই সময়। পুরনোদের অভিজ্ঞতা, নতুনদের উদ্যম–দুইয়ে মিলে আনতে পারে স্বনির্ভরতা। তাই ব্যবসায়ী-উদ্যোক্তাদের পথে প্রতিবন্ধকতার অপসারণ জরুরি। স্বেচ্ছা খেলাপিকে আই সি ইউতে রেখে অন্যান্যদের চাকাকে সচল করার জন্য প্রয়োজনীয় গ্রীজ-মবিল-অয়েল ইত্যাদির প্রয়োগের মাধ্যমে যদি শেষ চেষ্টাটা করা যায় ক্ষতি কি! একটি শিল্প কারখানা খেলাপির কারণে যদি পরিত্যক্ত লোহা লক্করে পরিণত হয় তা শুধু উদ্যোক্তার ক্ষতি নয়, বরং দেশের জন্য অপূরণীয় ক্ষতি। বিশুদ্ধ ব্যাংকিং চর্চাই অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধির ফুল ফোটাতে পারে, সে ফুল অবশ্যই ফুটবে। আর সে ফুলে সুভাসিত হবে বাংলাদেশ–এ প্রত্যাশা আমরা করতেই পারি।

তথ্যসূত্র

১। বাংলাদেশ ব্যাংক, চট্টগ্রাম।

২। দৈনিক প্রথম আলো ও দৈনিক বণিক বার্তার বিভিন্ন সংখ্যা।

৩। ফজলুল কাদের কাদেরী, ২০০৫, ব্যাংকিং পদ্ধতি ও সম্পর্কিত আইনাবলী, ফয়েজুল কাদের, ঢাকা।

৪। Debnath,2013, Dr. R.M, Business of Banking, Lotus Publishers, Dhaka.

৫। বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি সাময়িকী ২০১৭।